CENTRE FOR HEALTH AND POPULATION RESEARCH

HSB
স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বার্তা

বর্ষ ১ সংখ্যা ২ মার্চ ২০০৩

৬ পৃ: গনোরিয়ার রোগতত্ত্ব এবং বাংলাদেশে নাইসেরিয়া গনোরিয়াই-এর জীবাণুনাশক-সংক্রান্ত সংবেদনশীলতা পর্যবেক্ষণ কর্মসূচি (১৯৯৭-২০০২)

১০ পৃ: ২০০১ সালে ঢাকার একটি বস্তিতে ইনফ্লুয়েঞ্জা-সংক্রান্ত কমিউনিটি-ভিত্তিক পর্যবেক্ষণ কর্মসূচি

১৫ পৃ: ঢাকায় উদরাময় রোগতত্ত্বের (প্যাথোজেন) ধরন– সর্বশেষ পর্যবেক্ষণ

১৬ পৃ: ঘোষণা

আইসিডিডিআর,বি:
সেন্টার ফর হেলথ্ এ্যান্ড পপুলেশন রিসার্চ জিপিও বক্স ১২৮ ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

www.icddrb.org

ময়মনসিংহে কালাজ্বর, ২০০২

বাংলাদেশের ২ কোটি মানুষ কালাজ্বর-উপদ্রুত এলাকায় বাস করে। লেইশমেনিয়া ডোনোভানী নামক পরজীবী জীবাণুর কারণে এই রোগ হয় এবং এই জীবাণুর বাহক হলো বেলেমাছি বা স্যান্ডফ্লাই। এ-রোগের প্রতিরোধ ও চিকিৎসা পদ্ধতি চিহ্নিত করার জন্য ময়মনসিংহ জেলার ফুলবাড়িয়াতে কমিউনিটি-ভিত্তিক পর্যবেক্ষণ কর্মসূচি শুরু হয়েছে। চিহ্নিত ৩৫ জন রোগীর মধ্যে ৪ জন (১১.৮%) মারা গেছে; এদের ৩ জন চিকিৎসার একটি কোর্স সম্পূর্ণ করেছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রধান রোগ-লক্ষণ ছিল জ্বর, ওজন কমে-যাওয়া, তলপেটে ব্যথা, ত্বক কালো হয়ে-যাওয়া এবং কাশি। এছাড়া যকৃত ও প্লীহা ফুলে যাওয়ার মত লক্ষণগুলোও প্রায়ই লক্ষ করা গেছে।

২০০২ সালের জানুয়ারি মাসে ময়মনসিংহ জেলার ফুলবাড়িয়াতে একটি গ্রামের তিনটি অংশে একটি সক্রিয় কমিউনিটি-ভিত্তিক ভিসেরাল লেইশমেনিয়াসিস (ভিএল) বা কালাজ্বর পর্যবেক্ষণ কর্মসূচি চালু করা হয়। এই পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত দিয়ে একটি রোগতাত্ত্বিক গবেষণা পরিচালনা করা হবে, যার মাধ্যমে বাংলাদেশে কালাজ্বর বিস্তারের প্রকৃতি নির্ণয়, সংশ্লিষ্ট ঝুঁকিগুলো চিহ্নিতকরণ এবং এলাকা-ভিত্তিক অবহিতকরণ ও প্রতিকারমূলক কর্মসূচি প্রণয়নের মত কাজগুলো করা যাবে। বর্তমান প্রতিবেদন উল্লিখিত গবেষণা-এলাকায় কালাজ্বরের লক্ষণ ও চিকিৎসা-সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্যের কিছু প্রাথমিক উপাত্ত তুলে ধরছে।

কালাজ্বরের অতীত এবং বর্তমান রোগীদের চিহ্নিত করার জন্য ২,৩৪৮ জন অধিবাসী-অধ্যুষিত একটি এলাকার বাড়িতে-বাড়িতে একটি প্রাথমিক জরিপ করা হয়; একটি সক্রিয় পর্যবেক্ষণ কার্যসূচি চালু করা হয় ২০০২ সালের জানুয়ারি মাস থেকে। জরিপকালে কালাজ্বর সন্দেহে এক রোগীর অসুস্থতা প্রয়োজনীয় পরীক্ষান্তে কালাজ্বর বলেই প্রতীয়মান হয় এবং একটি বিশেষ ল্যাবরেটরি পরীক্ষার (rK39 dipstick) মাধ্যমে তা নিশ্চিত হয় (১)। সকল রোগীকে জাতীয় নীতিমালা অনুসারে (স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ১৯৯৫) চিকিৎসার জন্য ফুলবাড়িয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠানো হয়। ১০০ মি: গ্রা:/মি: লি: সোডিয়াম এন্টিমনি গ্লুকোনেট দিয়ে চিকিৎসা করা হয়। ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য এই ওষুধের ২০ মি: গ্রা: রোগীর শরীরের প্রতি কেজি ওজনের জন্য মোট ২০ দিন প্রয়োগ করা হয়। প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে প্রতিদিন অনূর্ধ ৮৫০ মি: গ্রা: অথবা ৮.৫ মি: লি: মাত্রায় ২০ দিন প্রদান করা হয়।

২০০২ সালের ১৫ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে সক্রিয় কালাজ্বরের ৩৫টি ঘটনা সনাক্ত করা হয়। পুরুষ (৫১%) এবং মহিলা (৪৯%) উভয়ই সমানভাবে আক্রান্ত হয় (সারণী ১) এদের গড় বয়স ছিল ২০ বছর (ব্যাপ্তি ৫-৪৫ বছর)। ২০০০ সালের আগস্ট থেকে ২০০২ সালের নভেম্বর মাসের মধ্যে রোগ সংক্রমণের ঘটনাগুলো ঘটে। রোগ নির্ণয়ের পূর্বে জ্বর ছিল গড়ে তিন মাস (ব্যাপ্তি ১-১৯ মাস)।

সারণী ১ঃ কালাজ্বরের রোগীদের বয়স এবং লিঙ্গ-ভিত্তিক সংখ্যা

বয়স (বছর)	পুরুষের সংখ্যা (%)	মহিলার সংখ্যা (%)	মৃত্যু
৩-৯	৫ (৫৬)	৪ (৪৪)	১
১০-১৯	৫ (৬৩)	৩ (৩৮)	০
২০-২৯	৫ (৫০)	৫ (৫০)	২
৩০-৩৯	২ (৫০)	২ (৫০)	০
৪০+	১ (২৫)	৩ (৭৫)	১
মোট	১৮ (৫১)	১৭ (৪৯)	৪

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রোগের লক্ষণগুলো ছিল জ্বর, ওজন কমে-যাওয়া, ক্ষুধামান্দ্য, তলপেটে ব্যথা, ত্বক কালো হয়ে-যাওয়া এবং কাশি। তাছাড়া, অন্যান্য যেসব লক্ষণ অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে সেগুলো হচ্ছে যকৃত ও প্লীহা ফুলে-যাওয়া (সারণী ২)।

চার জন (১১.৮%) রোগী মারা গেছে। মৃতদের মধ্যে ১ জন ছিল পুরুষ-শিশু, যার বয়স ৮ বছর; বাকি তিন জন ছিল প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা, যাদের বয়স ২০, ২৪, এবং ৪৫ বছর। ৪ জনের মধ্যে ৩ জন উল্লিখিত ২০ ডোজের চিকিৎসার কোর্স শেষ করার ১, ৬, এবং ৮ দিন পর মারা যায়। চতুর্থ রোগী মারা যায় ওষুধের কোর্স চলাকালে যখন তার শেষ ডোজ দেওয়া হয়েছে তার আনুমানিক ১০ ঘণ্টা পর। মরণের আগে রোগীদের দু'জনের ক্ষেত্রে জ্বর কমে যাওয়ার পর তীব্র জ্বরের পুনরাবৃত্তি ঘটে এবং আরেকজনের গুরুতর রক্তক্ষরণজনিত জটিলতা দেখা দিয়েছিল বলে জানা যায়।

তথ্যগুলো দিয়েছে ফুলবাড়িয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ; ডিজিজ কন্ট্রোল ডিভিশন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা; ডিভিশন অফ প্যারাসাইটিক ডিজিজেজ, ন্যাশনাল সেন্টার ফর ইনফেকশাস ডিজিজেজ, সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল এ্যান্ড প্রিভেনশন;

সারণী ২: কালাজ্বরের রোগীদের রোগের লক্ষণ ও উপসর্গ

রোগের লক্ষণ	সংখ্যা (%) [সর্বমোট ৩৪*]
দু-সপ্তাহের বেশি জ্বর	৩৪ (১০০)
ওজন কমে-যাওয়া	৩৪ (১০০)
খেতে অনিচ্ছা (ক্ষুধামান্দ্য)	৩১ (৯১)
তলপেটে ব্যথা	২৮ (৮২)
ত্বক কালো হয়ে-যাওয়া	২৮ (৮২)
কাশি	২৫ (৭৪)
তলপেট ফুলে-যাওয়া	২২ (৬৭**)
জন্ডিস	৫ (১৫**)
রক্তপাত (মাড়ী থেকে রক্তপড়া, নাক থেকে রক্তপড়া, মেনোর‍্যাজিয়া)	৮ (২৫**)

উপসর্গ	সংখ্যা (%) [সর্বমোট ৩৩*]
প্লীহা বেড়ে-যাওয়া	৩৩ (১০০)
ত্বক কালো হয়ে-যাওয়া	২৮ (৮৫)
যকৃত বড় হয়ে-যাওয়া	২৬ (৭৯)
ফ্যাকাশে হয়ে-যাওয়া	১৫ (৪৭)
তলপেট ফুলে-যাওয়া (সামান্য থেকে মাঝারি)	১৬ (৪৮)
জন্ডিস	১ (৩)

* একজন রোগীর কাছ থেকে তার রোগের লক্ষণ-সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায় নি এবং দু'জন রোগীর কাছ থেকে শারীরিক পরীক্ষার তথ্য পাওয়া যায় নি

** এই বিশেষ লক্ষণগুলোর ব্যাপারে আরো একজন রোগীর কাছ থেকে কোনো তথ্য পাওয়া যায় নি

প্যারাসাইটোলোজি ল্যাবরেটরি, ল্যাবরেটরি সায়েন্সেস ডিভিশন (এলএসডি); এপিডেমিক কন্ট্রোল প্রিপ্রেয়ার্ডনেস ইউনিট, পাবলিক হেলথ্ সায়েন্সেস ডিভিশন (পিএইচএসডি) এবং ইনফেকশাস ডিজিজেজ ইউনিট, হেলথ্ সিস্টেমস এ্যান্ড ইনফেকশাস ডিজিজেজ ডিভিশন (এইচএসআইডি), আইসিডিডিআর,বি।

এ-সমীক্ষা যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল এ্যান্ড প্রিভেনশন এবং গ্লোবাল ইমার্জিং ইনফেকশনস ইনিশিয়েটিভ-এর অর্থায়নে সম্পাদিত।

মন্তব্য

বাংলাদেশের ২ কোটি মানুষ কালাজ্বর-প্রবণ এলাকায় বাস করে; ৬৪টি জেলার ২৯টি এবং ৪৬৪টি উপজেলার ১০২টি থেকে কালাজ্বরের খবর পাওয়া গেছে (স্বাস্থ্য অধিদপ্তর)। ২০০০ সালে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগ নিয়ন্ত্রণ বিভাগে কালাজ্বরের সর্বাধিক খবর এসেছে ময়মনসিংহ (৩,৯১৬), পাবনা (৭৫৮), টাংগাইল (৫৬৩), এবং গাজীপুর (৩৩৪) জেলা থেকে। যথাযথ রোগ নির্ণয়ের সুবিধাযুক্ত স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে দরিদ্র রোগীদের সীমিত সামর্থ্যের কারণে উল্লিখিত সংখ্যা রোগীর প্রকৃত সংখ্যা থেকে অনেক কম বলে মনে করা যায়।

কালাজ্বর হচ্ছে এমন একটি ক্রনিক রোগ যাতে যকৃত, প্লীহা, মজ্জা এবং অন্যান্য লসিকা-টিসু পৌনপুনিকভাবে সংক্রামিত হয়। লেইশমেনিয়া ডোনোভানী (বাংলাদেশ, নেপাল, ভারত এবং পূর্ব-আফ্রিকার প্রধান প্রজাতি), এল চাগাসি (ল্যাটিন আমেরিকায়) এবং এল. ইনফেন্টাম (উত্তর-আফ্রিকা ও ভূমধ্যসাগর এলাকায়) নামক এককোষী পরজীবী জীবাণুর দ্বারা এই রোগ হয়ে থাকে। সংক্রামিত স্ত্রী বেলেমাছির কামড়ে লেইশমেনিয়া জীবাণু মানুষের মধ্যে ছড়ায়। কালাজ্বরের সুপ্তিকাল বিভিন্ন মেয়াদের হয়ে থাকে; এ-রোগের জীবাণু শরীরে ঢোকার পর রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় সাধারণত ২ থেকে ৬ মাসের মধ্যে, কিন্তু এ-লক্ষণ কয়েক বছর পরও প্রকাশ পেতে পারে (২)।

কালাজ্বরের কারণে সাধারণত জ্বর, ওজন কমে-যাওয়া, প্লীহা ও যকৃত ফুলে-যাওয়া হাইপার-গামাগ্লোবিউলিন্যামিয়া এবং প্যানসাইটোপেনিয়াযুক্ত মজ্জার বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে-যাওয়ার মত অসুস্থতাগুলো ক্রনিক আকারে দেখা দেয়। কালাজ্বরের কারণে লিউকোপেনিয়া এবং কোষ-প্রভাবিত রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতায় ত্রুটিও দেখা দেয়, যার ফলে রোগীদের কালাজ্বরের সাথে সাথে যক্ষা, ব্যাকটেরিয়াল নিউমোনিয়া এবং সেপসিসের মত রোগ-সংক্রমণেরও উচ্চমাত্রার ঝুঁকি থেকে যায়। রোগীদের মধ্যে সাধারণত রক্তশূন্যতা দেখা দেয় এবং তাদের থ্রোম্বোসাইটোপেনিয়াও হতে পারে। চিকিৎসা শুরু করার আগে ও পরে রক্তক্ষরণজনিত সমস্যার কথাও জানা যায় এবং এন্টিমোনিয়াল উপাদানের কারণে থ্রোম্বোসাইটোপেনিয়া হবার কথাও জানা যায় (৩)। দক্ষিণ-এশীয় অঞ্চলে কালাজ্বরের রোগীদের মাঝে ত্বক কালো হয়ে-যাওয়া একটি অতিপরিচিত লক্ষণ এবং এর সাথে আরেকটা সাধারণ লক্ষণ জ্বরের কারণেই সম্ভবত এ-রোগের হিন্দি নাম কালা-আজর বা কালাজ্বর হয়েছে। কী পদ্ধতিতে ত্বকের এই রং পরিবর্তনের ঘটনা ঘটে সে-সম্পর্কে এখনও জানা যায় নি।

সুনির্দিষ্টভাবে কালাজ্বর নির্ণয় করার জন্য মজ্জায় লেইশমেনিয়া এমাস্টিগোট অথবা প্লীহার এসপিরেট-এর উপস্থিতি দেখা প্রয়োজন। তবে গ্রামে বসবাসকারী রোগীদের পক্ষে পরজীবী জীবাণু পরীক্ষার সুবিধা গ্রহণ করা অধিকাংশ সময়ই দুরূহ। এর বিকল্প হিসেবে উপজেলা-পর্যায়ে সিরাম পরীক্ষা খুবই উপযোগী হতে পারে; এই পরীক্ষায় নিশ্চিত রোগ নির্ণয়ের একটা গ্রহণযোগ্যতাও থাকতে পারে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোতে কালাজ্বর রোগ নির্ণয়ের জন্য এটি একটি স্বল্প-ব্যয়ের কৌশল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে (৪)। কালাজ্বর নির্ণয়ে ডাইরেক্ট এগ্লুটিনেশন টেস্ট (DAT)

খুবই কার্যকর একটি সিরাম পরীক্ষার পদ্ধতি এবং উন্নয়নশীল দেশে এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। অবশ্য বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত DAT এন্টিজেন ব্যয়বহুল এবং স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত DAT এন্টিজেন-এর রক্ষণাবেক্ষণও কষ্টসাধ্য। rK39 dipstick হচ্ছে একটি নতুন ইমিউনোক্রোমাটোগ্রাফিক স্ট্রিপ পরীক্ষা যাতে রিকম্বিন্যান্ট লেইশমেনিয়া কে৩৯ এন্টিজেন ব্যবহার করা হয়।

মাঠ-পর্যায়ে ব্যবহার করা সহজ এবং উৎপাদন খরচ কম বিধায় ফুলবাড়িয়ার পর্যবেক্ষণ কর্মসূচি চলাকালে কালাজ্বর সন্দেহকৃতদের রোগ প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত করার জন্য rK39 dipstick ব্যবহার করা হয়। কালাজ্বর নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে এই পরীক্ষা খুবই কার্যকর এবং এর মাধ্যমে সুনির্দিষ্টভাবে রোগ নির্ণয় হয় বলে জানা গেছে (১)। কালাজ্বরের সাম্প্রতিক সাব-ক্লিনিক্যাল সংক্রমণগুলোতেও সিরাম পরীক্ষা (DAT অথবা rK39) ইতিবাচক দেখা গেছে। একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা রোগের বিস্তারিত ইতিহাস এবং রোগীর শারীরিক পরীক্ষাসহ সিরাম পরীক্ষা করলে পরীক্ষার সুনির্দিষ্টতা বৃদ্ধি পায়।

বর্তমানে কালাজ্বরের চিকিৎসায় কমপক্ষে ২০ দিনের প্যারেন্টার‍্যাল ওষুধ লাগে এবং এগুলো বেশ ব্যয়বহুল। বাংলাদেশে ব্যবহৃত প্রধান ওষুধ হচ্ছে পেন্টাভ্যালেন্ট এন্টিমনিজাতীয় ওষুধ বা সোডিয়াম স্টিবোগ্লুকোনেট, যাকে সোডিয়াম এন্টিমনি গ্লুকোনেট বা SAG-ও বলা হয়, যা ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে রোগীর শরীরের ওজনের প্রতি কেজির জন্য ২০ মি: গ্রা: প্রতিদিন সাধারণত ২০ থেকে ৩০ দিন নিতে হয়। চিকিৎসা শুরু করার ৩০ দিনের মধ্যে সাড়া না পাওয়া গেলে রোগটি ওষুধ-প্রতিরোধক বলে ধরে নেওয়া হয়। ১৯৭০-এর দশকের শেষদিকে ভারতের বিহারে যেখানে কালাজ্বরের এশীয় মহামারী শুরু হয়, এখন সেখানে ৬৫% ক্ষেত্রে কালাজ্বরের ওষুধ হিসেবে সোডিয়াম স্টিবোগ্লুকোনেইট অকার্যকর। এক্ষেত্রে চিকিৎসা করতে হয় অবশ্যই এমফোটেরিসিন দিয়ে, যা ৫ থেকে ১০ গুণ বেশি ব্যয়বহুল (৬)। চিকিৎসার প্রথম দিককার কষ্টকর ও সময়বহুল নিয়ম-কানুন ঠিকমত মানা হয় না বিধায় এতদঞ্চলে ওষুধের বিরুদ্ধে জীবাণুর প্রতিরোধ-ক্ষমতা বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

পেন্টাসিডাইন এবং এমফোটেরিসিন দিয়ে চিকিৎসা করার সুযোগ থাকায় একাধিক চিকিৎসা পদ্ধতি বেছে নেওয়া যায়, কিন্তু এগুলো বাংলাদেশে পাওয়া যায় কদাচিৎ। মিল্টাফোসাইন নামে মুখে খাবারযোগ্য একটা নতুন ওষুধ ফলপ্রসু বলে প্রতীয়মান হয়েছে এবং ভারতে পরিচালিত পরীক্ষাকালে ওষুধটিকে সহনীয় বলে গণ্য করা হয়েছে (৭); আশা করা হচ্ছে যে, নিকট-ভবিষ্যতে ওষুধটি বাংলাদেশে পাওয়া যাবে।

বিনা চিকিৎসায় কালাজ্বরের মৃত্যুহার বেশি বলে লক্ষ করা গেছে (প্রায় ৯০%); যেক্ষেত্রে চিকিৎসা করা হয়, সেক্ষেত্রে মৃত্যুহার ৩% থেকে ১৫% (৮,৯)। এই প্রতিবেদনে উল্লিখিত রোগীদের মধ্যে মৃত্যুহার অধিক ছিল বলে মনে করা যায়, বিশেষ করে এই বিবেচনায় যে মৃতদের ৩ জন সম্প্রতি এসএজি চিকিৎসার কোর্স সম্পূর্ণ করেছিল এবং আরেকজন সম্পূর্ণ করেছিল চিকিৎসার ৭০% ভাগ। এই মৃত্যুগুলোর সম্ভাব্য কারণ হতে পারে কালাজ্বরজনিত অন্যান্য জটিলতা, যেমন ২য়-পর্যায়ের ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ এবং রক্তক্ষরণ। এছাড়া, আরেকটা সম্ভাব্য কারণ হলো ওষুধের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতার অভাব। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এখন নেপাল ও ভারতে (বিহার ছাড়া) কালাজ্বরের জন্য এসএজি-এর ৩০টি ইঞ্জেকশনের একটি কোর্সের ব্যবস্থাপত্র অনুমোদন করেছে (১০); বাংলাদেশের

জন্যও এই একই চিকিৎসা-কোর্স বিবেচনা করা যেতে পারে। বাংলাদেশে কালাজ্বরের মৃত্যুহার কমিয়ে আনার বিষয়টি নির্ভর করছে প্রয়োজনে রক্তসঞ্চালনের মত সহায়ক চিকিৎসা এবং ২য়-পর্যায়ের ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের পর্যবেক্ষণ ও চিকিৎসার ওপর । বাংলাদেশে কালাজ্বর ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন গুরুতর ও জটিল ধরনের রোগের ওপর অধিকতর অনুসন্ধান এবং চিকিৎসার পর কালাজ্বরের সম্ভাব্য পুনরাক্রমণের বিষয়ে সতর্ক পর্যবেক্ষণ।

তথ্যনির্দেশ

১. বার্ণ সি, ঝা এসএন, যোশী এবি এবং অন্যান্য ॥ ইউজ অফ দি রিকম্বিন্যান্ট কে৩৯ ডিপস্টিক টেস্ট এ্যান্ড দি ডাইরেক্ট এগ্লুটিনেশন টেস্ট ইন এ সেটিং এনডেমিক ফর ভিসেরাল লেইশমেনিয়াসিস ইন নেপাল ॥ এ্যাম জে ট্রোপ মেড হাইজ ॥ ২০০০;৬৩:১৫৩-৭

২. ম্যাগিল এজে ॥ লেইশমেনিয়াসিস ॥ মূল: স্ট্রিকল্যান্ড জিটি ॥ হান্টারস' ট্রপিক্যাল মেডিসিন এ্যান্ড ইমার্জিং ইনফেকশাস ডিজিজেস ॥ ৮ম সংস্করণ ॥ ফিলাডেলফিয়া: ডব্লু বি সন্ডার্স, ২০০২:পৃ. ৬৭২

৩. হেপবার্ণ এনসি ॥ থ্রোম্বোসাইটোপেনিয়া কমপ্লিকেটিং সোডিয়াম স্টিবোগ্লুকোনেট থেরাপি ফর কিউটেনিয়াস লেইশমেনিয়াসিস ॥ ট্র্যান্স আর সক ট্রোপ মেড হাইজ ১৯৯৩ নভ-ডিসে;৮৭(৬):৬৯১

৪. বোয়েলার্ট এম, লিনেন এল, দেজো পি, ভ্যান স্টুইফ্ট পি ॥ কস্ট-ইফেকটিভনেস অফ কমপিটিং ডায়াগনোসটিক-থেরাপিউটিক স্ট্র্যাটেজিস ফর ভিসেরাল লেইশমেনিয়াসিস ॥ বুল ওয়ার্ল্ড হেল্থ অর্গান ১৯৯৯;৭৭:৬৬৭-৭৪

৫. সুন্দার এস, রীড এসজি, সিং ভিপি, কুমার পিসি, মারে এইচডব্লিউ ॥ র‍্যাপিড একিউরেট ফিল্ড ডায়াগনোসিস অফ ইন্ডিয়ান ভিসেরাল লেইশমেনিয়াসিস ॥ ল্যানসেট ১৯৯৮;৩৫১:৫৬৩-৫

৬. সুন্দার এস, মোর ডিকে, সিং এমকে, সিং ভিপি, শর্মা এস, মাখারিয়া এ এবং অন্যান্য ॥ ফেইলিউর অফ পেন্টাভালেন্ট এন্টিমনি ইন ভিসেরাল লেইশমেনিয়াসিস ইন ইন্ডিয়া: রিপোর্ট ফ্রম দি সেন্টার অফ দি ইন্ডিয়ান এপিডেমিক ॥ ক্লিন ইনফেক্ট ডিস ২০০০;৩১:১১০৪-৭

৭. সুন্দার এস, ঝা টিকে, ঠাকুর সিপি, এঙ্গেল জে, সিন্ডারম্যান এইচ, ফিশার সি এবং অন্যান্য ॥ ওরাল মিল্টাফোসিন ফর ইন্ডিয়ান ভিসেরাল লেইশমেনিয়াসিস ॥ এন ইংল্যান্ড জে মেড ॥ ২০০০;৩৪৭(২২):১৭৩৯-৪৬

৮. আহসান এইচএ, চৌধুরী এমএ, আজহার এমএ এবং অন্যান্য ॥ ডেথ্ ইন ভিসেরাল লেইশমেনিয়াসিস (কালা-আজর) ডিউরিং ট্রিটমেন্ট ॥ মেড জে মালয়েশিয়া ॥ ১৯৯৬;৫১:২৯-৩২

৯. বোরা ডি ॥ এপিডেমিওলোজি অফ ভিসেরাল লেইশমেনিয়াসিস ইন ইন্ডিয়া ॥ ন্যাশনাল মেড জে ইন্ডিয়া ॥ ১৯৯৯;১২:৬২-৮

১০. কার্কি পি, কৈরালা এস, পারিজা এসসি এবং অন্যান্য ॥ এ থার্টি-ডে কোর্স অফ সোডিয়াম স্টিবোগ্লুকোনেট ফর ট্রিটমেন্ট অফ কালা-আজর ইন নেপাল ॥ সাউথ ইস্ট এশিয়ান জার্নাল অব ট্রপ মেড পাবলিক হেল্থ ॥ ১৯৯৮;২৯:১৫৪-৮

গনোরিয়ার রোগতত্ত্ব এবং বাংলাদেশে নাইসেরিয়া গনোরিয়াই-এর জীবাণুনাশক-সংক্রান্ত সংবেদনশীলতা পর্যবেক্ষণ কর্মসূচি (১৯৯৭-২০০২)

গনোরিয়ার রোগতত্ত্ব ও নাইসেরিয়া গনোরিয়াই-এর জীবাণুনাশক-সংক্রান্ত সংবেদনশীলতা নির্ণয় করার জন্য উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ আচরণের ১০৩৩ জন রোগীর গনোকক্কাল জীবাণু পরীক্ষা করা হয়। যৌনরোগ সংক্রমণের প্রায়োগিক ব্যবস্থাপনার জন্য প্রারম্ভিক চিকিৎসা হিসেবে সংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতিমালা অনুযায়ী সিপ্রোফ্লোক্সাসিন ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়। যাহোক, <৫% জীবাণুকে সিপ্রোফ্লোক্সাসিন, পেনিসিলিন এবং টেট্রাসাইক্লিনের প্রতি সংবেদনশীল পাওয়া যায় আর ≥ ৯৮% ভাগ জীবাণুকে সেফট্রায়াক্সোন, সেফিক্সাইম ও এজিথ্রোমাইসিনের প্রতি সংবেদনশীল পাওয়া যায়। সংবেদনশীলতা-সংক্রান্ত উপাত্ত পাওয়া গেলে এগুলো চিকিৎসা-সম্পর্কিত নীতিমালা হালনাগাদ করার জন্য এবং বিভিন্ন গবেষণা কর্মসূচির সাফল্যের জন্য সহায়ক হবে।

বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য কর্মসূচি বিদ্যমান থাকার পরও গনোরিয়া সংক্রমণ উন্নয়নশীল দেশগুলোর ব্যাধি-সংকটের (ডিজিজ বার্ডেন) একটা বিরাট উৎস; বিশেষ করে মহিলাদের মধ্যে এর প্রকোপ উল্লেখযোগ্য (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ১৯৯৫)। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা গনোরিয়াসহ যৌনরোগ সংক্রমণকে রুগ্নতার অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে (http://www.who.int/asd/knowledge/facsheet.html)। খুব কম উন্নয়নশীল দেশেই নিয়মিত রোগ যাচাই কর্মসূচি থাকায় গনোরিয়া সংক্রমণের তথ্য তেমনভাবে জানা যায় না। বর্তমান প্রতিবেদনে বাংলাদেশের বিভিন্ন উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর ওপর ১৯৯৭ সাল থেকে পরিচালিত যৌনরোগ সংক্রমণ (এসটিডি) পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্য সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে পর্যবেক্ষণ পরিচালনা করা হয় ঢাকার ভাসমান মহিলা যৌনকর্মীদের ওপর, যাদের কারো কারো ক্ষেত্রে রোগের লক্ষণ ছিল স্পষ্ট এবং কারো কারো ক্ষেত্রে অস্পষ্ট। পরবর্তীকালে পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম ঢাকা, সিলেট, চট্টগ্রাম ও যশোরের অন্যান্য উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী তথা পতিতালয় এবং হোটেল-ভিত্তিক যৌনকর্মী, পুরুষ সমকামী, ট্রাক-চালক এবং যৌনরোগ-সংক্রামিত পুরুষদের মাঝেও সম্প্রসারিত করা হয়।

যৌনরোগ সংক্রমণের জীবাণুতাত্ত্বিক, রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতাবিষয়ক এবং অণু-ভিত্তিক প্রকৃতি নির্ধারণের এবং নাইসেরিয়া গনোরিয়াই (গনোকক্কাস)-এর জীবাণুনাশক-সংক্রান্ত সংবেদনশীলতা পর্যবেক্ষণ করার জন্য ইউএসএআইডি-র সহায়তায় আইসিডিডিআর,বি এক অত্যাধুনিক গবেষণাগার স্থাপন করেছে। এছাড়াও, আইসিডিডিআর,বি আরো চারটি আরটিআই/এসটিআই গবেষণাগার স্থাপন করেছে, যার দু'টি চট্টগ্রামে এবং একটি করে যশোরে ও সিলেটে।

সারণী ১ঃ ঢাকার ভাসমান যৌনকর্মীদের মাঝে গনোকক্কাল সংক্রমণের হার

সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা (সর্বমোট ২১১৭)	নাইসেরিয়া গনোরিয়াইতে-তে আক্রান্তদের সংখ্যা (শতকরা হার*)	বছর
২২৪	৯৪ (৪২%)	১৯৯৭
২৯৬	৯২ (৩১%)	১৯৯৮
২৮৮	১১২ (৩৯%)	১৯৯৯
৫৯৯	২১৬ (৩৬%)	২০০০
৪৭৩	১৩২ (২৮%)	২০০১
২৩৭	৪৭ (২০%)	২০০২

* জরায়ুমুখ এবং মূত্রনালী থেকে নেওয়া শ্লেষ্মার কালচারের মাধ্যমে নাইসেরিয়া গনোরিয়াই-এর উপস্থিতি সনাক্ত করা হয়েছে

১৯৯৭ সাল থেকে চলমান গনোরিয়া পর্যবেক্ষণে মোট ৩৪২৫ জনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যাদের কারো কারো ক্ষেত্রে রোগের লক্ষণ ছিল স্পষ্ট এবং কারো কারো ক্ষেত্রে অস্পষ্ট। উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ আচরণের এই ব্যক্তিদের মধ্যে ৩০০০ জন মহিলা যৌনকর্মী, ১৬৭ জন পুরুষ যৌনরোগী এবং ২৫৮ জন পুরুষ সমকামী। উল্লিখিত ১৯৯৭ সাল থেকে এ-যাবত ঢাকার রাস্তায় ভ্রাম্যমান ২১১৭ জন যৌনকর্মীর

সারণী ২ঃ ২০০২ সালে পৃথকীকৃত ৩৩৭টি নাইসেরিয়া গনোরিয়াই-এর জীবাণুনাশক-সংক্রান্ত সংবেদনশীলতা

জীবাণুনাশক উপাদান	সংবেদনশীল (%)	হ্রাসকৃতভাবে সংবেদনশীল (%)	প্রতিরোধী (%)
এজিথ্রোমাইসিন	৯৮	১.৫	০.৫
সেফিক্সাইম	১০০	০	০
সেফট্রায়াক্সোন	৯৮	২	০
সিপ্রোফ্লোক্সাসিন	৪.৪	৫.১	৯০.৫
পেনিসিলিন	১.৭	৩৬.৩	৬২
স্পেকটিনোমাইসিন	১০০	০	০
টেট্রাসাইক্লিন	০.৬	৪.৭	৯৪.৭

(যাদের কখনও কখনও ভাসমান যৌনকর্মী হিসেবেও উল্লেখ করা হয়) মধ্যে গনোকক্কাল সংক্রমণের উপস্থিতি ৩২.৭%; তবে এই গ্রুপের মধ্যে গনোরিয়ার হার ১৯৯৭ সালের ৪২% থেকে কমে ২০০২ সালে ২০%-এ নেমে এসেছে (সারণী ১)। এর বিপরীতে ২০০২ সালের এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে, ঢাকার হোটেল-ভিত্তিক যৌনকর্মীদের মধ্যে গনোরিয়া রোগের উপস্থিতির হার ছিল ৩৬%। যশোরের এক পতিতাপল্লীর যৌনকর্মীদের মধ্যে ১৯৯৯ সালে গনোরিয়ার হার ছিল ২৯%; ২০০২ সালে এই হার কমে ১৪%-তে দাঁড়িয়েছে।

পেনিসিলিন, টেট্রাসাইক্লিন, সিপ্রোফ্লোক্সাসিন, সেফট্রায়াক্সোন, স্পেকটিনোমাইসিন, এজিথ্রোমাইসিন এবং সেফিক্সাইম-এর জীবাণুনাশক-সংক্রান্ত সংবেদনশীলতা নির্ণয়ের জন্য ১৯৯৭ সাল থেকে মোট ১০৩৩টি গনোকক্কাল জীবাণু পরীক্ষা করা হয়েছে। জীবাণুগুলোতে পেনিসিলিনেজ সৃষ্টিকারী নাইসেরিয়া গনোরিয়াই (PPAG) আছে কি না এবং প্লাজমিড-প্রভাবিত টেট্রাসাইক্লিনকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আছে কি না সে-বিষয়েও পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষায় ৩ বা তার অধিক ওষুধের প্রতি সহনশীল জীবাণুকে 'বহু-ওষুধ-প্রতিরোধক' নাইসেরিয়া গনোরিয়াই হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরি স্ট্যান্ডার্ড-সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির তথ্য অনুযায়ী ২০০২ সালে বিদ্যমান ৫%-এর কম জীবাণুকে পেনিসিলিন, টেট্রাসাইক্লিন অথবা সিপ্রোফ্লোক্সাসিন প্রতিরোধে সক্ষম বলে পাওয়া যায় (সারণী ২); ৯৮% বা তারও অধিক জীবাণুকে সেফট্রায়াক্সোন, সেফিক্সাইম এবং এজিথ্রোমাইসিন প্রতিরোধে সক্ষম হিসেবে পাওয়া যায়। এজিথ্রোমাইসিন-প্রতিরোধী জীবাণুর শতকরা হার <১% হলেও সংবেদনশীল জীবাণুগুলোর সর্বনিম্ন মাত্রার ওষুধের প্রতি সহনশীলতা দ্রুত বেড়ে চলেছে। ২০০২ সালে ১০% জীবাণুতে এজিথ্রোমাইসিনের এমআইসি ছিল ≥ ০.২৫ মাইক্রোগ্রাম/মি:লি: (চিত্র ১)। সিপ্রোফ্লোক্সাসিনের প্রতি প্রতিরোধের মাত্রা এবং বহু-ওষুধের প্রতি প্রতিরোধের মাত্রাও দ্রুত বেড়ে গেছে, ১৯৯৭ সালে যা ছিলো ৯% সেখানে ২০০২ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯০%-তে এবং বহু-ওষুধে

চিত্র ১ঃ ১৯৯৭-২০০২ সালে গনোকক্কাল জীবাণুসমূহে সিপ্রোফ্লোক্সাসিন-প্রতিরোধী, বহু-ওষুধ-প্রতিরোধী এবং ০.২৫ মাইক্রোগ্রাম/মি:লি: (এমআইসি)-এর বেশি সংস্পৃক্ত এজিথ্রোমাইসিনের প্রতি সহনশীল জীবাণু-এর উপস্থিতি

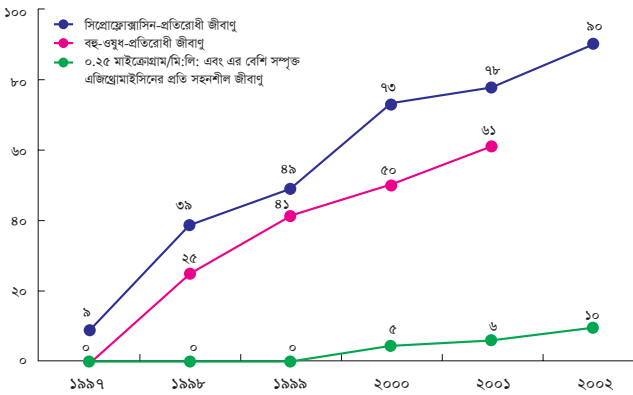

চিত্র ২: ১৯৯৭-২০০২ সালে পেনিসিলিন এবং টেট্রাসাইক্লিন-প্রতিরোধী প্লাজমিডযুক্ত জীবাণুর উপস্থিতি

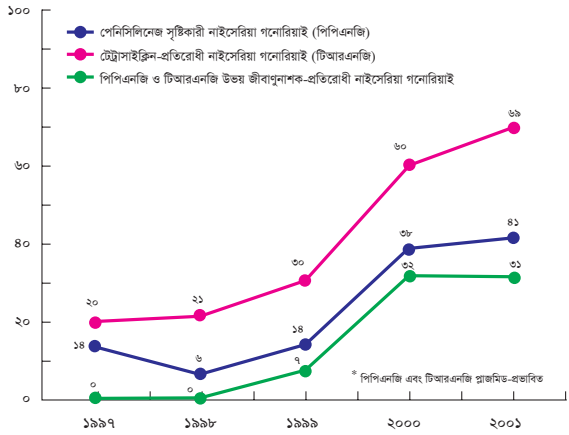

সহনশীলতার মাত্রা ১৯৯৭ সালের ০% থেকে বেড়ে ২০০২ সালে হয়েছে ৬১% (চিত্র ১)।

পিপিএনজি এবং টিআরএনজি-এর উপস্থিতিও ক্রমাগত বাড়ছে (চিত্র ২)। এর মধ্যে বিশেষভাবে অস্বস্থিকর হলো উভয় ধরনের প্লাজমিডবাহী জীবাণুর উত্থান। ১৯৯৭ সালে পরীক্ষাকৃত জীবাণুসমূহের কোনোটাতেই পেনিসিলিন এবং টেট্রাসাইক্লিনের প্রতি প্লাজমিড-প্রভাবিত প্রতিরোধ-ক্ষমতা দেখা যায় নি, কিন্তু ২০০২ সালে ৩০% ভাগ জীবাণুতেই এই প্রতিরোধ-ক্ষমতা পাওয়া গেছে।

এসব তথ্য যেসব সূত্র থেকে পাওয়া গেছে, তার মধ্যে আছে: রিপ্রোডাকটিভ ট্র্যাক্ট ইনফেকশন্স/সেক্সুয়ালী ট্রান্সমিটেড ইনফেকশন্স ল্যাবেরটরি, ল্যাবেরটরি সায়েন্সেস ডিভিশন (এলএসডি) এবং হেলথ্ সিস্টেমস্ এ্যান্ড ইনফেকশাস ডিজিজেজ ডিভিশন (এইচএসআইডি), আইসিডিডিআর,বি; কনসার্ণ বাংলাদেশ; কেয়ার বাংলাদেশ; ফ্যামিলি হেলথ্ ইন্টারন্যাশনাল; দি স্যালভেশন আর্মি; বন্ধু সোস্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন; মমতা; পরিচর্যা; সৃষ্টি; এবং এমএজি ওসমানি মেডিকেল কলেজ, সিলেট।

এই সমীক্ষা ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউএসএআইডি) এবং দি সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট এ্যান্ড কো-অপারেশন-এর অর্থায়নে সম্পাদিত হয়েছে।

মন্তব্য

উন্নত দেশগুলোতে গত দশকে গনোকক্কাল সংক্রমণের হার ব্যাপকভাবে কমে গেলেও (১,২) উন্নয়নশীল দেশগুলোতে গনোরিয়া এখনও অন্যতম প্রধান যৌনতাবাহিত সংক্রমণ (এসটিআই) বিদ্যমান। বর্তমান প্রতিবেদনের একটি উৎসাহব্যাঞ্জক দিক হচ্ছে গত পাঁচ বছরে পেশাদার যৌনকর্মীদের মধ্যে গনোকক্কাল সংক্রমণ হ্রাসের বিষয়টি। এই সাফল্য উক্ত সময়সীমায় বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রতিরোধ কর্মসূচির ফল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এতদসত্ত্বেও জীবাণুনাশক ওষুধের বিরুদ্ধে নাইসেরিয়া গনোরিয়াই-এর প্রতিরোধ-ক্ষমতার আবির্ভাব গনোরিয়া নিয়ন্ত্রণে একটি বড় বাধা। পূর্ববর্তী গবেষণাসমূহে দেখা গেছে যে, সংক্রমণকারী জীবাণু সংশ্লিষ্ট ওষুধের প্রতি সহনশীল হলে গনোকক্কাল সংক্রমণের চিকিৎসা প্রায়ই ব্যর্থ হয় (৩)। এ-প্রতিবেদনের তথ্য থেকে জানা যায় যে, বাংলাদেশে গনোরিয়ার চিকিৎসায় সিপ্রোফ্লোক্সাসিনের ব্যবহার অকার্যকর এবং আরো জানা যায় যে, সিপ্রোফ্লোক্সাসিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিকল্প এজিথ্রোমাইসিন-এর প্রতিও এই জীবাণুর সংবেদনশীলতা দ্রুত কমে যাচ্ছে।

গনোরিয়া নিয়ন্ত্রণের কৌশল হিসেবে প্রায়শই রোগ নির্ণয়কালে এক-ডোজে প্রদত্ত ওষুধ-ভিত্তিক চিকিৎসা পদ্ধতির ওপর নির্ভর করা হয়েছে; এ-পদ্ধতি বেশ কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে (৪)। গনোরিয়া এবং অন্যান্য যৌনতাবাহিত সংক্রমণের চিকিৎসা পদ্ধতি সাধারণত পূর্বে সংগৃহীত জীবাণুসমূহের ওষুধের প্রতি সংবেদনশীলতার ধরনের ওপর নির্ভর করে, এটা সংক্রমণকারী জীবাণুর

ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয় না, কারণ চিকিৎসা প্রদান করা হয় সংশ্লিষ্ট স্থানে রোগ নির্ণয়কালেই এবং কালচারের ফলাফল পাওয়া যাওয়ার আগেই। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা গনোকক্কাল জীবাণুর ওষুধের প্রতি সংবেদনশীলতা কর্মসূচি (Gonococcal Antimicrobial Susceptibility Programme: GASP) নামক একটি নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করেছে এবং প্রাপ্ত তথ্য চিকিৎসা-সংক্রান্ত বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্য একটি পরামর্শ প্রণয়ন করার জন্য ব্যবহার করা হয়। ১৯৯৮ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা গনোকক্কাল সংক্রমণের চিকিৎসার জন্য এক-ডোজে সিপ্রোফ্লোক্সাসিন ৫০০ মি:গ্রা: মুখে খাবার জন্য, অথবা ওফ্লোক্সাসিন ৪০০ মি:গ্রা: মুখে খাবার জন্য, বা সেফট্রায়াক্সোন ১২৫ মি:গ্রা: পেশীতে ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে গ্রহণ করার পরামর্শ দেয় (৫)। বাংলাদেশসহ এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলে গনোকক্কাল জীবাণুর সিপ্রোফ্লোক্সাসিনের প্রতি বর্ধিত প্রতিরোধ লক্ষ করার কারণে সিডিসি এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এশিয়ায় এখন আর সিপ্রোফ্লোক্সাসিনসহ কোনোরূপ ফ্লুরোকুইনোলোন ব্যবহার করার পরামর্শ দেয় না (৬); এর বদলে এ-অঞ্চলে জটিল নয় এমন ধরনের গনোরিয়ার জন্য এখন সেফিক্সাইম ৪০০ মি:গ্রা: মুখে খাবার জন্য অথবা সেফট্রায়াক্সোন ২৫০ মি:গ্রা: পেশীতে ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

বাংলাদেশের অনেক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী সংস্থা যৌনতাবাহিত সংক্রমণ ব্যবস্থাপনায় বর্তমানে জাতীয় নীতিমালা অনুসরণ করছে, যে-নীতিমালায় গনোরিয়ার প্রারম্ভিক চিকিৎসার জন্য এখনও সিপ্রোফ্লোক্সাসিনের কথা বলা আছে। এ-প্রতিবেদনে প্রাপ্ত তথ্য থেকে বলা যায় যে, বাংলাদেশে বিভিন্ন ঔষধের প্রতি গনোরিয়া জীবাণুর সংবেদনশীলতা-সংক্রান্ত বিদ্যমান তথ্যের আলোকে জাতীয় চিকিৎসা-নীতিমালার পরামর্শগুলোর পুনর্মূল্যায়ন এবং পরিবর্তন প্রয়োজন। গনোকক্কাল-এর ওষুধ-সংক্রান্ত সংবেদনশীলতার দ্রুত পরিবর্তনশীল চরিত্রকে বিবেচনায় রেখে ওষুধের সংবেদনশীলতা পর্যবেক্ষণের কর্মসূচিগুলো বহাল রাখা জরুরী। বিভিন্ন এসটিআই কার্যক্রমের সাফল্যের জন্য মাঝেমাঝে সংবেদনশীলতা-সংক্রান্ত উপাত্তসমূহ পর্যালোচনা করা এবং চিকিৎসা-সংক্রান্ত নীতিমালা হালনাগাদ করাও জরুরী। এই বুলেটিনের আগামী সংখ্যাগুলোর 'সর্বশেষ পর্যবেক্ষণ' বিভাগে থাকবে নাইসেরিয়া গনোরিয়াই-এর জীবাণুনাশক-সংক্রান্ত সংবেদনশীলতা পরীক্ষার সর্বশেষ ফলাফল।

তথ্যনির্দেশ

১। ডি শ্রাইভার এ এবং মেহয়েস এ ॥ এপিডেমিওলোজি অফ সেক্সুয়ালী ট্রান্সমিটেড ডিজিজেজ: দি গ্লোবাল পিকচার ॥ বুল ওয়ার্ল্ড হেলথ্ অর্গান ১৯৯১:৬৮:৬৩৯-৫৪

২। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ॥ গ্লোবাল প্রিভ্যালেন্স এ্যান্ড ইনসিডেন্স অফ সিলেক্টেড কিউরেবল সেক্সুয়ালী ট্রান্সমিটেড ডিজিজেজ: ওভারভিউ এ্যান্ড এস্টিমেটস ॥ জেনেভা: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ১৯৯৫ (ডব্লুএইচও/জিপিএ/এসটিডি ৯৫.১ রিভ ১):২৬ পৃ:

৩। রহমান এম, আলম এ, নেসা এবং অন্যান্য ॥ ট্রিটমেন্ট ফেইলিউর উইথ দি ইউজ অফ সিপ্রোফ্লোক্সাসিন ফর গনোরিয়া কোরিলেটস্ উইথ দি প্রিভ্যালেন্স অফ ফ্লুরোকুইনোলোন-রেসিসট্যান্ট নাইসেরিয়া গনোরিয়াই স্ট্রেইন ইন বাংলাদেশ ॥ ক্লিন ইনফেক্ট ডিজ ২০০১, মার্চ ১৫; ৩২(৬):৮৮৪-৯

৪। র‍্যাডক্লিফ কেডব্লিও ॥ ইনট্রোডাকশন; ইউরোপিয়ান এসটিডি গাইডলাইন ॥ ইন্ট জে এসটিডি এইড্স্ ২০০১;১২ (সাপ্লি ৩):২-৩

৫। সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল এ্যান্ড প্রিভেনশন ॥ ১৯৯৮ গাইডলাইনস ফর ট্রিটমেন্ট অফ সেক্সুয়ালী ট্রান্সমিটেড ডিজিজেজ ॥ এমএমডব্লুআর রিকোম রিপ ১৯৯৮;৪৭:(আরআর-১):১-১১১

৬। সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল এ্যান্ড প্রিভেনশন ॥ সেক্সুয়ালী ট্রান্সমিটেড ডিজিজেজ ট্রিটমেন্ট গাইডলাইনস ২০০২ ॥ এমএমডব্লুআর রিকোম রিপ ২০০২;৫১:(আরআর-৬):১-৭৮

২০০১ সালে ঢাকার একটি বস্তিতে ইনফ্লুয়েঞ্জা-সংক্রান্ত কমিউনিটি-ভিত্তিক পর্যবেক্ষণ কর্মসূচি

কমলাপুরে জ্বর-ব্যাধির কমিউনিটি-ভিত্তিক পর্যবেক্ষণ কর্মসূচি চলাকালে ১৩ বছরের কম-বয়সী ১৩০টি ছেলেমেয়েকে জ্বরজনিত শ্বাসতন্ত্রের রোগে আক্রান্ত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এদের ২১ জনের (১৭.৬%) সাম্প্রতিক কালে ইনফ্লুয়েঞ্জা সংক্রমণ হয়েছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রায় সবগুলো সংক্রমণই ঘটেছিল গ্রীষ্মকালে, যা নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে ইনফ্লুয়েঞ্জা আক্রমণের স্বাভাবিক ধরনের থেকে বিপরীত (নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে এর প্রকোপ দেখা দেয় প্রধানত শীতকালে)। ইনফ্লুয়েঞ্জা-এ এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা-বি, উভয় ধরনের সংক্রমণই পাওয়া গেছে। বাংলাদেশের শিশুদের শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণের জন্য ইনফ্লুয়েঞ্জা একটি প্রধাণ কারণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রতিরোধকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে গ্রহণ করেছে, কারণ প্রতিবছর সারা বিশ্বে নানা রোগের যেসব মহামারী দেখা দেয় তাতে ইনফ্লুয়েঞ্জা বিরূপ প্রভাব ফেলে (১)। ইনফ্লুয়েঞ্জা খুব সহজেই ছড়ায় এবং এই রোগের কারণে প্রাথমিক ভাইরাসজনিত নিউমোনিয়া, ২য়-পর্যায়ের ব্যাকটেরিয়াল নিউমোনিয়া, ওটাইটিস মিডিয়া এবং এগুলোর কারণে সৃষ্ট অন্যান্য জটিলতা থেকে শুরু করে ব্যাপক সংখ্যায় মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে (২,৩)। ঘন জনবসতিপূর্ণ ও দরিদ্র বাংলাদেশের লোকজন ব্যাপকভাবে ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হতে পারে। এতদসত্ত্বেও ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের বিস্তার-সংক্রান্ত সাম্প্রতিক কোনো তথ্য বাংলাদেশ এবং এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে পাওয়া যায় না। স্বাস্থ্যবিষয়ক অগ্রাধিকারমূলক বিভিন্ন বিষয়ের সাথে ইনফ্লুয়েঞ্জার তুলনামূলক ব্যাপকতা বের করতে এবং সে-অনুযায়ী এর প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণের কার্যকর কৌশল নির্ধারণের জন্য ইনফ্লুয়েঞ্জার ওপর জনসংখ্যা ও গবেষণাগার-ভিত্তিক উপাত্ত খুবই সহায়ক হবে বলে প্রতীয়মান হয়।

জ্বরজনিত শ্বাসতন্ত্রের অসুস্থতায় ইনফ্লুয়েঞ্জার ভূমিকা এবং বাংলাদেশে ইনফ্লুয়েঞ্জা আক্রমণের মৌসুম চিহ্নিত করার জন্য ডিসেম্বর ২০০০ থেকে অক্টোবর ২০০১ সময়সীমায় একটি কমিউনিটি-ভিত্তিক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী শিশুদের কাছ থেকে সংগৃহীত সিরাম পরীক্ষার একটি গবেষণা পরিচালনা করা হয়। ডেঙ্গু এবং অন্যান্য জ্বরজনিত রোগের জন্য চলমান একটি পর্যবেক্ষণ কর্মসূচির প্রয়োজনে ঢাকা মহানগরীর দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত আইসিডিডিআর,বি-র প্রকল্প-এলাকায় (কমলাপুর নগর-পর্যবেক্ষণ এলাকায়) বসবাসকারী ৮২৪ জনের কাছ থেকে এই সিরাম সংগ্রহ করা হয়। ইনফ্লুয়েঞ্জা-সংক্রান্ত সিরাম পরীক্ষার জন্য ১৩ বছরের কম বয়সের ১৩০টি ছেলেমেয়ের একটি উপদল বেছে নেয়া হয়, যাদের ডেঙ্গু জ্বর কোনো পরীক্ষায় প্রমাণিত হয় নি। রোগের মাত্রা যখন তীব্র ছিল তখন এবং সুস্থ হয়ে-ওঠার পর্যায়ে তাদের সিরাম সংগ্রহ করা হয়। এই শিশুদের কাশি ছিল ৫ দিনের কম এবং জ্বর ছিল কমবেশী ৩৮.৫০ সেঃ। ইনফ্লুয়েঞ্জা হেমাগ্লুটিনেশন ইনহিবিশন পদ্ধতি ব্যবহার করে শিশুদের জোড়া সিরাম নমুনাগুলো আটলান্টা'র সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল এ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি)-তে পাঠিয়ে পরীক্ষা করা হয় (৪)।

চারটি ভিন্ন ধরনের ভাইরাসের এন্টিবডির পরিমাণ পরীক্ষা করা হয়। এগুলো হচ্ছে: এ/নিউ ক্যালডোনিয়া/২০/৯৯ (এইচ১এন১), এ/পানামা/২০০৭/৯৯ (এইচ৩এন২) এবং ২ টি ইনফ্লুয়েঞ্জা বি ভাইরাস (যার একটি হচ্ছে বি/ভিক্টোরিয়া/৫০৪/২০০০, যেটি বি/সিচুয়ান/৩৭৯/৯৯ ধরনের ভাইরাস এবং অপরটি বি/হংকং/২২/২০০১, যেটি বি/ভিক্টোরিয়া/২/৮৭ ধরনের ভাইরাস। এই গ্রুপের ভাইরাস ১৯৯০ সালের দিকে এশিয়ার কয়েকটি অঞ্চল ছাড়া পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই বিলুপ্ত হয়ে যায়, পরে ২০০১ সালের শেষদিকে এটি আবার দেখা দেয়। তীব্র সংক্রমণকালীন সময় থেকে আরোগ্য লাভ-পর্যায়ের সিরামের নমুনাগুলোতে এন্টিবডি টাইটার (titre)-এর বৃদ্ধি যদি চারগুণ বা

চিত্র ১ঃ ডিসেম্বর ২০০০-অক্টোবর ২০০১ সময়সীমায় কমলাপুর নগর-পর্যবেক্ষণ এলাকায় ইনফ্লুয়েঞ্জার মাসওয়ারি সংক্রমণ

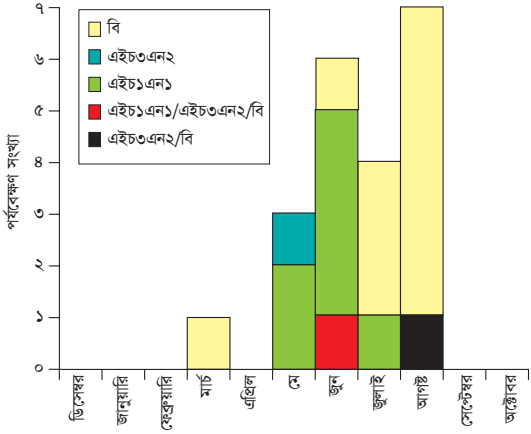

তার বেশি হয় তবে এটাকে সাম্প্রতিক সংক্রমণের প্রমাণ হিসেবে গণ্য করা হয়। এই বৃদ্ধি চারগুণ না পাওয়ার ক্ষেত্রে একক সিরামে ৪০ বা এর বেশি টাইটার পাওয়া গেলে এটিকে অতীত ইনফ্লুয়েঞ্জা সংক্রমণের প্রমাণ হিসেবে গণ্য করা হয়।

২১ জন (১৭.৬%) শিশুর মধ্যে নিকট-অতীতে এক বা একাধিকবার ইনফ্লুয়েঞ্জা সংক্রমণের এন্টিবডিগত প্রমাণ পাওয়া যায়; এদের মধ্যে একটি শিশুর ক্ষেত্রে দু'টি ভাইরাসের এন্টিবডিতে সেরো-কনভার্সান পাওয়া যায় এবং অন্য একটি শিশুর বেলায় তা পাওয়া যায় তিনটি ভাইরাসের এন্টিবডিতে (সম্ভবত এটি উভয় শিশুর সিরামেই ক্রস-রিয়্যাকটিভিটি থাকার প্রমাণ)। ১৩টি ইনফ্লুয়েঞ্জা-বি সেরোকনভার্সন (যার সবগুলোর ক্ষেত্রেই বি/ভিক্টোরিয়া/৫০৪/২০০০ ভাইরাসের সংক্রমণ ছিল), ৮টি এ (এইচ১এন১) সেরোকনভার্সন, এবং ৩টি এ (এইচ৩এন২) সেরোকনভার্সন পাওয়া যায়। এছাড়াও, ৬৩টি (৪৮%) শিশুর পূর্বে ইনফ্লুয়েঞ্জা সংক্রমণ হওয়ার এন্টিবডিগত প্রমাণ পাওয়া যায়; এদের ৫২ (৪০%) জনের ছিল ইনফ্লুয়েঞ্জা-এ (এইচ৩এন২) ভাইরাসের সংক্রমণ। ইনফ্লুয়েঞ্জার এই বিশেষ জীবাণুটি ১৯৯০-এর দশকের কয়েক বছর বিশ্বব্যাপী প্রাধান্য বিস্তার করেছিল (চিত্র ১)।

দেখা যায়, ইনফ্লুয়েঞ্জা দেখা দিয়েছিলো বর্ষাকালে (জুন-আগস্ট) এবং এটাই ছিল এ-সময়ের জ্বরজনিত শ্বাসতন্ত্রের অসুস্থতার প্রধান কারণ। ১৩ বছর কম-বয়সী ছেলেমেয়েদের পুরো এক বছরের উপাত্ত বিশ্লেষণের পর জানা যায় যে, এই বয়সের ছেলেমেয়ের মধ্যে ইনফ্লুয়েঞ্জা সংক্রমণের হার প্রতি ১০০০ জনে ৫.০ জন।

এসব তথ্যের সূত্রগুলো হলো: ইনফ্লুয়েঞ্জা ব্রাঞ্চ, ডিভিশন অব ভাইরাল এ্যান্ড রিকেটসিয়াল ডিজিজেস, ন্যাশনাল সেন্টার ফর ইনফেকশাস ডিজিসেস, সেন্টারস্ ফর ডিজিজ কন্ট্রোল এ্যান্ড প্রিভেনশন এবং ইনফেকশাস ইউনিট, হেলথ সিস্টেমস্ এ্যান্ড ইনফেকশাস ডিজিজেস ডিভিশন (এইচএসআইডি) ও ভাইরোলজী ল্যাবরেটরি, ল্যাবরেটরি সায়েন্সেস ডিভিশন, আইসিডিডিআর,বি।

এ-সমীক্ষা সেন্টারস্ ফর ডিজিজ কন্ট্রোল এ্যান্ড প্রিভেনশন-এর অর্থায়নে সম্পাদিত।

মন্তব্য

এই প্রতিবেদনের ফলাফল পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে শিশুদের শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণের একটা প্রধান কারণ হচ্ছে ইনফ্লুয়েঞ্জা। পূর্ববর্তী সমীক্ষাগুলোর সময়ও বাংলাদেশের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন শিশুদের মধ্যে নিম্ন-শ্বাসতন্ত্রের গুরুতর সংক্রমণের রোগী পাওয়া গেছে (৫,৬)। তবে এ-বিষয়ে সাম্প্রতিক কোনো তথ্য পাওয়া যায় নি।

গবেষণার জন্য সিরাম নির্বাচনের বিধিবদ্ধ নিয়ম-কানুনের জন্য (যেমন, কেবল ≥ ৩৮.৫° সে: তাপমাত্রার ব্যক্তিদেরকেই সমীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়), গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের জোড়া রক্ত-

নমুনার অসম্পূর্ণ সংগ্রহের কারণে এবং প্রকৃত অবস্থার চেয়ে কম জানতে পারার কারণে ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের বিস্তার ও মাত্রা মূল্যায়ন করতে গেলে সেটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবার সম্ভাবনা প্রবল। এছাড়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা-আক্রান্ত শিশুদের বেলায় প্রাপ্তবয়স্কদের তুলনায় সেরো-কনভার্ট হবার সম্ভাবনা কম। এ-কারণেও ইনফ্লুয়েঞ্জা সংক্রমণের হার কম বলে মনে হতে পারে। আরো একটি কারণ হতে পারে মাঝারি ধরনের অপুষ্টিতে ভুগছে এমন শিশুরা যাদের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল। বর্তমান সমীক্ষায় প্রাপ্ত ইনফ্লুয়েঞ্জা সংক্রমণের হারের এক বিপরীত চিত্র পাওয়া যায় নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে, যেখানে শিশুদের মাঝে বার্ষিক ইনফ্লুয়েঞ্জা সংক্রমণের হার ১০-২০% (৭)। সেখানে সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ৪০% জনের মধ্যে ইনফ্লুয়েঞ্জা-এ (এইচ৩এন২) এবং বি-সিচুয়ান ধরনের ভাইরাসের ক্ষেত্রে টাইটার-এর মান পাওয়া যায় ৪০, যা উচ্চমাত্রায় পূর্বতন ইনফ্লুয়েঞ্জা সংক্রমণের বিষয়টি নির্দেশ করে।

উল্লিখিত উপাত্তসমূহ এ-কথাই প্রমাণ করে যে, বাংলাদেশের শহর-এলাকায় ব্যাপকভাবে জ্বরজনিত শ্বাসতন্ত্রের রোগ সৃষ্টিকারী ইনফ্লুয়েঞ্জা সংক্রমণের ঘটনা ঘটতে পারে। সিরাম পরীক্ষার ফলাফল থেকে ইনফ্লুয়েঞ্জা-এ (এইচ১এন১), এ (এইচ৩এন২) এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা-বি সংক্রমণের প্রমাণ পাওয়া যায় (৮,৯)। গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিদ্যমান তিনটি জীবাণুই ২০০১-২০০২ সালের ইনফ্লুয়েঞ্জার টীকাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

উত্তর-গোলার্ধের নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলসমূহে ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রকোপ দেখা যায় ডিসেম্বর-মার্চ মাসে, আর দক্ষিণ-গোলার্ধের নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলগুলোতে এর প্রকোপ দেখা যায় জুন থেকে আগষ্ট মাস পর্যন্ত। ২০০১ সালে বাংলাদেশে যখন ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রকোপ চলছিল, উত্তরাঞ্চলের নাতিশীতোষ্ণ দেশগুলোর কোথাও তখন এ-রোগটি ছিল না। বাংলাদেশের অবস্থান নাতিশীতোষ্ণ এবং গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলসমূহের মধ্যবর্তী স্থানে এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মাঝামাঝি স্থানে হওয়ায় দেশটি ব্যাপক লোক-চলাচলকারী ঘনবসতিপূর্ণ এ-দু'টি অঞ্চলের মধ্যে নতুন জাতের ভাইরাস বিস্তারের করিডোরে পরিণত হতে পারে। ফলে উত্তর- অথবা দক্ষিণ-গোলার্ধ থেকে আসা ভাইরাস এখানকার ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় এবং পরে অন্যান্য অঞ্চলে দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে।

ইনফ্লুয়েঞ্জা দীর্ঘকাল থেকে বিরাজিত একটি সংক্রামক রোগ, যার বীজাণু বংশগতি এবং এন্টিজেন পরিবর্তনের মাধ্যমে নিজকে পরিবর্তিত করতে পারে। ভাইরাসের বিভাজনের সময় পয়েন্ট মিউটেশন অর্জনের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত ইনফ্লুয়েঞ্জা জীবাণুর নতুন নতুন টাইপ আবির্ভূত হচ্ছে। ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের এই পরিবর্তনকে ড্রিফট (drift) নামে অভিহিত করা হয়। একই ধরনের ইনফ্লুয়েঞ্জার (এ বনাম বি) অথবা ইনফ্লুয়েঞ্জা-এ সাব-টাইপ (এইচ৩এন২ বনাম এইচ১এন১)-এর পূর্বতন জীবাণুগুলোর বিরুদ্ধে সৃষ্ট এন্টিবডি আবির্ভূত নতুন জীবানুগুলোর প্রতিরোধে কার্যকর নাও হতে পারে। এ-কারণে প্রতিবছর ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারী আকারে দেখা দিতে পারে এবং লোকজন তাদের সারাজীবনে বেশ কয়েকবার ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হতে পারে। ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসে মাঝেমধ্যে শিফট (shift) নামে অভিহিত এক ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। এটি ঘটে তখনই যখন একটি নতুন ধরনের 'এ' সাব-টাইপ ইনফ্লুয়েঞ্জা আবির্ভূত হয়, যার বিরুদ্ধে লোকজনের কোনোরূপ প্রতিরোধ-ক্ষমতা নেই; থাকলেও খুব সামান্য পরিমাণে আছে। বিশেষ করে শুকর বা পাখিজাতীয় প্রাণীদের কাছ থেকেও একটি নতুন সাব-টাইপ আবির্ভূত হতে পারে অথবা প্রাণীর ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের সাথে মানুষের ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের একটি সম্মিলিত রূপ থেকেও এটি আবির্ভূত হতে পারে। অসুস্থতা সৃষ্টিকারী এবং একজন থেকে আরেকজনের মধ্যে সহজেই সংক্রামিত হতে পারে এমন ধরনের নতুন ইনফ্লুয়েঞ্জা 'এ' সাব-টাইপ বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়তে পারে। বিংশ শতাব্দীতে মোট তিনবার, যথা ১৯১৮-১৯১৯, ১৯৫৭-১৯৫৮ এবং ১৯৬৪-১৯৬৯ সালে ইনফ্লুয়েঞ্জা বিশ্বব্যাপী

মহামারী আকারে দেখা দেয়। এর মধ্যে ১৯১৮ সালের আক্রমণ ছিল ভয়ংকর; এতে পৃথিবীব্যাপী ২ থেকে ৫ কোটি লোকের মৃত্যু হয়। সুতরাং বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়তে পারে সম্ভাব্য এমন ধরনের ভাইরাসকে দ্রুত চিহ্নিত করাটা আন্তর্জাতিক জনস্বাস্থ্যের জন্য জরুরী একটা বিষয়। বাংলাদেশে একটা নতুন জীবাণু বা নতুন ইনফ্লুয়েঞ্জা-এ সাব-টাইপ বিস্তৃত জায়গায় ছড়াতে পারে। কিন্তু বিশ্বের অন্যত্র যেখানে পর্যবেক্ষণ কর্মসূচি চালু আছে এমন একটি জায়গায় ছড়ানোর আগে পর্যন্ত এটি চিহ্নিত না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

চরম জনবহুলতার কারণে বাংলাদেশের পরিবেশ একটি নতুন ধরনের ইনফ্লুয়েঞ্জা জীবাণু বা ব্যাপকভাবে পরিব্যাপ্ত নতুন ইনফ্লুয়েঞ্জা-এ ভাইরাস দ্রুত মহামারী আকারে ছড়ানোর অনুকূল। অধিকন্তু, বাংলাদেশে মানুষ, হাঁস-মুরগি ও অন্যান্য জীবজন্তু খুব কাছাকাছি অবস্থান করার পরিবেশ বিদ্যমান থাকায় এখানে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসগুলো বিভিন্নভাবে সম্মিলিত ও পুনর্বিভাজিত হয়ে একটা নতুন এবং প্রচণ্ড ক্ষতিকর ইনফ্লুয়েঞ্জা-এ সাব-টাইপ ভাইরাস সৃষ্টি হতে পারে, যা দ্রুত পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়তে পারে।

২০০১ সালে ইনফ্লুয়েঞ্জা মৌসুমের চূড়ান্ত সময়ে বাংলাদেশে ডেঙ্গু মৌসুমও বিরাজমান ছিল। স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের জন্য এই দু'টি রোগের প্রায় একই রকম বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা কঠিন হতে পারে। রোগের লক্ষণ অনুযায়ী ডেঙ্গু জ্বর হিসেবে চিহ্নিত রোগটি আসলে ইনফ্লুয়েঞ্জা বা অন্য কোনো প্যাথোজেনের কারণেও হতে পারে। সুতরাং যথাযথভাবে ডেঙ্গু রোগ নির্ণয়ের জন্য গ্রহণযোগ্য পর্যায়ের উপযুক্ততা ও সুনির্দিষ্টতাসম্পন্ন বিভিন্ন রোগ নির্ণয়-সংক্রান্ত পরীক্ষার সাহায্য নেওয়া জরুরী, যেগুলো একই সংগে নির্ভরযোগ্য কিন্তু ব্যয়বহুল নয়।

তথ্যনির্দেশ

১। গ্লোবাল এজেন্ডা অন ইনফ্লুয়েঞ্জা সার্ভেল্যান্স এ্যান্ড কন্ট্রোল: প্রায়রিটি একটিভিটিস এ্যান্ড কী একশনস টু রিডিউস মরবিডিটি এ্যান্ড মরটালিটি ফ্রম এনুয়্যাল ইনফ্লুয়েঞ্জা এপিডেমিকস এ্যান্ড টু প্রিপেয়ার ফর দি নেক্সট প্যানডেমিক ॥ এটি নিম্নবর্ণিত ইন্টারনেট ঠিকানায় পাওয়া যাবে: http://www.who.int/emc/diseases/ flu/global_agenda_report/content.htm

২। কক্স এনজে, ফুকুদা কে ॥ ইনফ্লুয়েঞ্জা ॥ ইনফেক্ট ডিজ ক্লিন নর্থ অ্যাম ১৯৯৮;১২:২৭-৩৮॥

৩। থম্পসন ডব্লিউ ডব্লিউ, শে ডিকে, ভাইনট্রাউব ই এবং অন্যান্য ॥ মরটালিটি এসোসিয়েটেড উইথ ইনফ্লুয়েঞ্জা এ্যান্ড রেসপিরেটরি সিনসাইশিয়াল ভাইরাস ইন দি ইউনাইটেড স্টেটস্ ॥ জেএএমএ ২০০৩;২৮৯:১৭৯-৮৬

৪। কেনডেল এপি, পেরেরিয়া এমএস, স্কেহেল জে ॥ কনসেপ্ট এ্যান্ড প্রসিডিউর ফর ল্যাবরেটরি-বেইজড্ ইনফ্লুয়েঞ্জা সার্ভেল্যান্স ॥ জেনেভা: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ১৯৮২॥

৫। হক এফ, রহমান এম, নাহার এন এবং অন্যান্য ॥ একিউট লোয়ার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন ডিউ টু ভাইরাস এমাঙ হসপিটালাইজড্ চিলড্রেন ইন ঢাকা, বাংলাদেশ ॥ রেভ ইনফেক্ট ডিজ ১৯৯০;১২ (সাপ্লি ৮): এস৯৮২-৭

৬। রহমান এম, হক এফ, স্যাক ডিএ এবং অন্যান্য ॥ একিউট লোয়ার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন ইন হসপিটালাইজড্ পেশ্যান্ট উইথ ডায়রিয়া ইন ঢাকা, বাংলাদেশ ॥ রেভ ইনফেক্ট ডিজ ১৯৯০;১২ (সাপ্লি ৮): এস৮৯৯-৯০৬

৭। সুলিভ্যান কেএম ॥ হেলথ্ ইমপ্যাক্ট অফ ইনফ্লুয়েঞ্জা ইন দি ইউনাইটেড স্টেটস্ ॥ ফার্মাকোইকোনোমিকস ১৯৯৬;৯(সাপ্লি ৩):২৬-৩৩; ডিসকাসন ৫০-৩

৮। সেন্টারস্ ফর ডিজিজ কন্ট্রোল এ্যান্ড প্রিভেনশন ॥ আপডেট: ইনফ্লুয়েঞ্জা একটিভিটি--ইউনাইটেড স্টেটস্ এ্যান্ড ওয়ার্ল্ডওয়াইড, ২০০০-০১ সিজন, এ্যান্ড ২০০১-০২ ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসীন ॥ এমএমডব্লিউআর ২০০০;৫০:৪৬৬-৭০

৯। সেন্টারস্ ফর ডিজিজ কন্ট্রোল এ্যান্ড প্রিভেনশন ॥ আপডেট: ইনফ্লুয়েঞ্জা একটিভিটি--ইউনাইটেড স্টেটস্ এ্যান্ড ওয়ার্ল্ডওয়াইড, মে-সেপ্টেম্বর ২০০১ ॥ এমএমডব্লিউআর ২০০১;৫০:৮২২-৫

সর্বশেষ পর্যবেক্ষণ

স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বার্তা'র প্রতিসংখ্যায় পূর্ববর্তী সংখ্যায় প্রদত্ত পর্যবেক্ষণবিষয়ক উপাত্তের হালনাগাদ তথ্য পরিবেশন করা হবে। এই হালনাগাদকৃত সারণী এবং চিত্রগুলোতে প্রকাশনাকালীন সময়ে প্রাপ্ত সর্বশেষ পর্যবেক্ষণ কর্মসূচির তথ্যগুলো প্রতিফলিত হবে। আমরা আশা করছি, রোগ বিস্তারের বর্তমান ধরন এবং রোগের ঔষুধ প্রতিরোধ সম্পর্কে আগ্রহী স্বাস্থ্যগবেষকদের কাছে এই তথ্যগুলো সহায়ক হবে।

চিত্র ১: জীবাণুনাশক ঔষধের প্রতি ডায়রিয়া প্যাথোজেনের (%) সংবেদনশীলতা: জুলাই ২০০২-জানুয়ারি ২০০৩

জীবাণুনাশক উপাদান	শিগেলা (সর্বমোট ১৯২)	ভি. কলেরি ০১ (সর্বমোট ৩৩৫)	ভি. কলেরি ০১৩৯ (সর্বমোট ২৪)
ন্যালিডিক্সিক এসিড	৪৯.০	এনটি	এনটি
মেসিলিন্যাম	১০০	এনটি	এনটি
এম্পিসিলিন	৪৩.০	এনটি	এনটি
টিএমপি-এসএমএক্স	৪১.০	০.৩	১০০
সিপ্রোফ্লোক্সাসিন	১০০	১০০	১০০
টেট্রাসাইক্লিন	এনটি	১০০	১০০
এরিথ্রোমাইসিন	এনটি	১০০	১০০
ফুরাজোলিডিন	এনটি	০.০	১০০

চিত্র ২ঃ প্রতিমাসে প্রাপ্ত ভি. কলেরি ০১, ভি. কলেরি ০১৩৯, শিগেলা এবং রোটাভাইরাসের তুলনামূলক চিত্র: জুলাই ২০০২ - জানুয়ারি ২০০৩

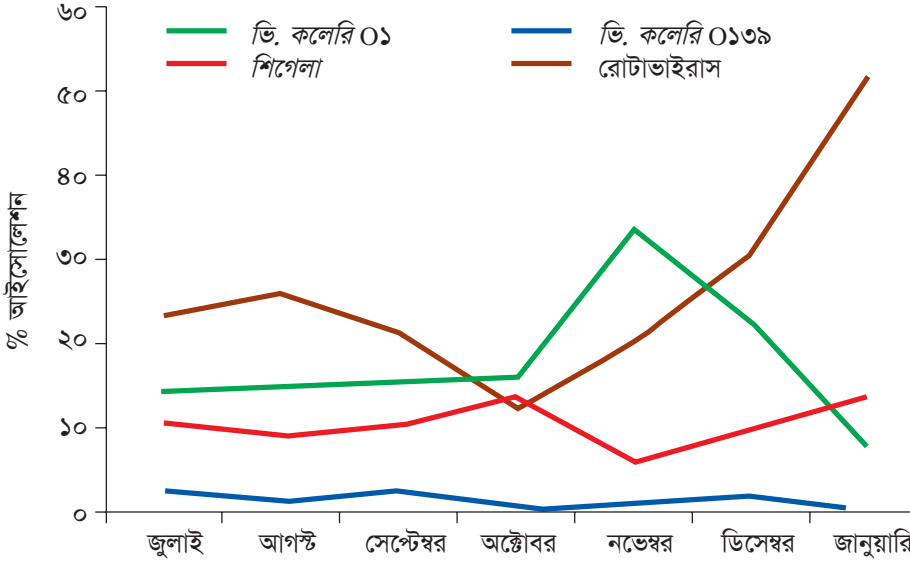

চিত্র ৩ঃ ১৮৭টি এম. টিউবারকিউলোসিস জীবাণুর ওষুধের প্রতি প্রতিরোধের ধরন: জানুয়ারি ২০০২-নভেম্বর ২০০২

ঔষধ	প্রতিরোধের ধরন		
	প্রাইমারী (সর্বমোট ১৪৭)	একোয়ার্ড (সর্বমোট ৪০)*	মোট (সর্বমোট ১৮৭)
স্ট্রেপটোমাইসিন	৫২ (৩৫.৪)	১৮ (৪৫.০)	৭০ (৩৭.৪)
আইসোনায়াজিড (আইএনএইচ)	১২ (৮.২)	১০ (২৫.০)	২২ (১১.৮)
ইথামবিউটল	১০ (৬.৮)	৬ (১৫.০)	১৬ (৮.৬)
রিফাম্পিসিন	৪ (২.৭)	১০ (২৫.০)	১৪ (৭.৫)
এমডিআর (আইএনএইচ+রিফামপিসিন)	২ (১.৪)	৮ (২০.০)	১০ (৫.৩)
অন্যান্য ঔষধ	৬০ (৪০.৮)	২২ (৫৫.০)	৮২ (৪৩.৯)

( ) শতকরা হার

*১ মাস বা তার বেশি যক্ষার ওষুধ গ্রহণ করেছে

উন্নয়নশীল দেশগুলোর স্বাস্থ্যসমস্যা নিরসনে আইসিডিডিআর,বি র অংগীকারের সাথে সহমর্মী দেশ ও সংস্থাগুলোর কাছ থেকে আইসিডিডিআর,বি অবারিতভাবে আর্থিক সহায়তা পেয়ে আসছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, বেলজিয়াম, কানাডা, জাপান, হল্যান্ড, সুইডেন, শ্রীলংকা, সুইজারল্যান্ড, যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন সাহায্য সংস্থা। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ইউনিসেফ।

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞানবার্তা কানাডার আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা (সিডা)-র আর্থিক সহায়তায় প্রকাশিত।

সম্পাদক: রবার্ট ব্রাইম্যান এবং পিটার থর্প
সম্পাদনা বোর্ড: বরকত-এ-খোদা, চার্লস লারসন এবং নিগার শহিদ
বাংলা অনুবাদ: ম. ফজলে রাব্বী
বাংলা সম্পাদনা: এম এ রহীম ও ম. ফজলে রাব্বী
কপি সম্পাদনা ও মুদ্রণ তত্ত্বাবধান: তালুত সোলায়মান
সম্পাদনা সহকারী: হামিদা আক্তার

আইসিডিডিআর,বি: সেন্টার ফর হেলথ্ এ্যান্ড পপুলেশন রিসার্চ
ডিপিও বক্স নং ১২৮
ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ
www.icddrb.org

ঘোষণা

৭-৯ ডিসেম্বর ২০০৩

টেন্থ্ এশিয়ান কনফারেন্স অন ডায়রিয়াল ডিজিজ এ্যান্ড নিউট্রিশন

উদরাময় রোগ এবং পুষ্টিসম্পর্কিত ১০ম এশীয় সম্মেলন (ASCODD ২০০৩) ঢাকাতে অনুষ্ঠিত হবে। এবারের সম্মেলনের প্রতিপাদ্য হবে 'শিশু-স্বাস্থ্যের উন্নয়ন'। ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া, অপুষ্টি, ইত্যাদি বিষয়-সংক্রান্ত গবেষণার ফলাফল এই সম্মেলনে উপস্থাপিত হবে। বিস্তারিত তথ্য যথাসময়ে জানানো হবে। এ-বিষয়ে ascodd@icddrb.org-এ যোগাযোগ করুন।

৮-২৩ সেপ্টেম্বর ২০০৩

আইসিডিডিআর,বি-হাওয়ার্ড হিউজ মেডিকেল ইনস্টিটিউট ট্রেনিং কোর্স অন ইনফেকশাস ডিজিজ রিসার্চ ইন বাংলাদেশ

এই প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্দেশ্য হচ্ছে উন্নয়নশীল দেশের গবেষকদেরকে সংক্রামক রোগের গবেষণায় আধুনিক ল্যাবরেটরি কৌশল প্রয়োগে আরো সক্ষম করে তোলা এবং গবেষণা দক্ষতাকে উন্নততর করা। দু'সপ্তাহের এই প্রশিক্ষণ কোর্সটিতে সংক্রামক রোগবিষয়ক গবেষণা এবং বায়োইনফরমেটিক্স্ (কম্পিউটেশনাল বায়োলজি)-এর ধ্যান-ধারণায় ব্যবহৃত আধুনিক অণু-ভিত্তিক এবং রোগ-প্রতিরোধ-বিষয়ক কৌশলগুলোর ওপর আলোকপাত করা হবে।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন:
ড: রাশিদুল হক
ল্যাবরেটরি সায়েন্সেস ডিভিশন, আইসিডিডিআর,বি
ফোনঃ ৮৮০-২-৮৮১১৭৫১ অথবা ৮৮০-২-৯৮৮১০৯০
ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৮৮১২৫২৯ অথবা ৮৮০-২-৮৮২৩১১৬

ই-মেইলঃ adlsd@icddrb.org
আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখঃ ৩০ এপ্রিল ২০০৩